রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটির মান-৫

প্রশ্ন ১ "পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা আমাদের মতো হাল-বলদ নিয়ে চাষআবাদ করে"—পাহাড়ের নীচের অঞ্চলে কাদের বাস? তাদের জীবনযাত্রা কীরূপ? ৫

উত্তর ◈ উদ্ধৃত অংশটি লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'গারো পাহাড়ের নীচে' রচনার অন্তর্গত। আলোচ্য অংশে লেখক উপজাতি অধ্যুষিত গারো পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলের, সেখানকার মানুষদের সম্পর্কে বলেছেন। এখানে বেশিরভাগ লোকজনই গারো, হাজং, কোচ, বানাই, ডালু-মার্গান উপজাতির সম্প্রদায়ভুক্ত।

গারো-হাজং, কোচ প্রভৃতি উপজাতির মানুষেরা মূলত কৃষিজীবী। সমতলের মানুষদের মতোই হাল-বলদ নিয়ে এরা চাষাবাদ করে। হাজং ও ডালুদের মুখের ভাষাও বাংলা। তবে উচ্চারণের জন্য একটু পার্থক্য বর্তমান। আবার গারোদের ভাষা একেবারেই অন্য। হাজংরা 'ত' কে 'ট' আর 'দ' কে 'ড' বলে উচ্চারণ করে থাকে। হাজংরাই এই অঞ্চলে সংখ্যায় বেশি।

হাজংদের বিশ্বাস তারাই এই অঞ্চলের প্রাচীন উপজাতি। এই অঞ্চলে আসার পর থেকেই তারা কৃষিবিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করে। হাজং শব্দের অর্থ পোকা। তাই হাজংদের 'চাষের পোকা' বলা হয়ে থাকে।

গারোদের বাসস্থান একটু উঁচুতে। এরা বাঁশের বা কাঠের মাচা তৈরি করে তার ওপর ঘরবাড়ি তৈরি করে। মাচার উপরে এদের শোয়াবসা, রান্নাবান্না সব কিছুই। এমনকি তাদের পোষা হাঁস, মুরগিও তাদের সঙ্গে উঁচু ঘরেই বাস করে। এই অঞ্চলের বন্য জন্তুদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ভয়েই এই অবস্থা। গারোদের ঘরগুলি উঁচু হওয়ায় অনেক দূর থেকে তা দেখা যায়। তবে এরা সকলেই জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা অত্যাচারিত ও পীড়িত।

Scanned with CamScanner

উত্তর ◊ লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে উপজাতি অধ্যুষিত গারো পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন। এই অঞ্চলে যেসব উপজাতি বাস করে তাদের মধ্যে হাজং, গারো, কোচ, বানাই, ডালু, মার্গান প্রভৃতি প্রধান। এরা আমাদের মতোই হাল-বলদ নিয়ে চাষাবাদ করে। মুখ চোখে তাদের পাহাড়ি ছাপ। এখানকার মানুষদের উচ্চারণ একটু আলাদা। এরা অনেকে 'ত' কে বলে 'ট'। আবার 'ট' কে বলে 'ত'। তারা 'ড'কে 'দ' বলে আবার 'দ' কে 'ড'। অনেক লোক দুধকে বলে 'ডুড'।

গারোদের ঘরবাড়ি সাধারণ ঘরবাড়ির থেকে একটু আলাদা ধরনের। তাই দূর থেকে দেখলে সহজেই সেগুলি চেনা যায়। এরা মাচা করে ঘর তৈরি করে। মাচার ওপরই শোয়া, রান্নাবান্না ও খাওয়াদাওয়া। সেইসঙ্গে তাদের পোষা হাঁস-মুরগিও থাকে। এটা তাদের পাহাড়ি স্বভাব। সাধারণত বন্য জন্তুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এখানকার হাজং সম্প্রদায় খুবই পরিশ্রমী। এরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে—পাহাড়ের বুক চিরে সবুজ ফসল ফলায়। ধান চাষই প্রধান। ধান কাটার সময় পুরুষ-নারী উভয়েই কাস্তে হাতে মাঠে যায়। পিঠে আঁটি বাঁধা ধান নিয়ে ছোটো ছোটো ছেলের দল কুঁজো হয়ে খামারে ছোটে।

হাজংদের মাঠ থেকে ধান নিয়ে আসার সময় জমিদাররা সেই ফসলের ওপর ভাগ বসায়। তারা এসে চাষিদের কাছ থেকে ফসল কেড়ে নেয়। তাই হাজংদের জীবনে কষ্টের আর শেষ থাকে না।

এ ছাড়াও হাতি বেগার-এর পাল্লায় পড়ে হাতি ধরতে গিয়ে বাঘের থাবায় কিংবা সাপের কামড়ে অনেক প্রজার প্রাণ যায়। হাজং শব্দের অর্থ পোকা। চাষবাসে দক্ষ হওয়ার জন্য তাদের চাষের পোকা বলা হয়।

প্রশ্ন ৩ **"তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল"—(ক) প্রজারা কেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে? (খ) তাদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন কে? (গ) তারা কীভাবে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল?** ২+১+২

Scanned with CamScanner

(গ) প্রজারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে মিটিং করতে থাকে। সেই সব মিটিং-এ জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নানা পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কামারশালায় তৈরি হতে থাকে নানা হাতিয়ার, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। যেন ঘরে ঘরে সবাই তৈরি কেবল সময়ের অপেক্ষা—

"প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে"।

প্রশ্ন ৪ প্রজাদের ওপর জমিদারেরা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করত তার মধ্যে একটি নাম করো। সেই আইন সম্পর্কে সংক্ষেপে জানাও। ২+৩

উত্তর ◊ লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'গারো পাহাড়ের নীচে' রচনায় জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনি—দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের কাহিনি—'জোর যার মুল্লুক তার' এই কাহিনি। প্রজারা এ ব্যাপারে জমিদারের কাছে কোনো দিনই ন্যায় বিচার পায়নি। জমিদাররা নিত্য নতুন আইন প্রণয়ন করে প্রজাদের নানাভাবে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় ছাড়াও বাটা, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি প্রভৃতি আরও নানা কর আদায় করতেন।

জমিদাররা গারো পাহাড়ের নীচে বসবাসকারী প্রজাদের ওপর নিত্যনতুন করের বোঝা চাপিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন না—কীভাবে তাদের আরও বিপাকে ফেলা যায় তার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করতেন। এ রকম একটি আইন হল 'হাতি বেগার' আইন।

প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও এই অঞ্চলে যে আইনটি প্রচলিত ছিল তা হল 'হাতি বেগার' আইন। জমিদারদের হাতি ধরার শখ ছিল খুব। তার জন্য পাহাড়ে মাচা বাঁধা হত। মাচার ওপর সেপাই সান্ত্রী নিয়ে নিরিবিলিতে বসে থাকতেন জমিদার। যাতে করে হিংস্র পশুতে তাঁকে আক্রমণ করতে না পারে। কিন্তু তাঁর কাছে তাঁর প্রজাদের জীবনের কোনো মূল্যই নেই। প্রত্যেক গ্রাম থেকে প্রজাদের আসা বাধ্যতামূলক ছিল। প্রজাদের সঙ্গে করে খাবারদাবার, চিড়ে-মুড়ি বেঁধে আনতে হত। যে জঙ্গলে হাতি আছে সেই জঙ্গল ঘিরে দাঁড়াতে হবে। এতে করে হাতির পায়ে, বাঘের থাবায়, সাপের দংশনে অনেক প্রজাই মারা যেত। কিন্তু জমিদারের সে ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

Scanned with CamScanner

উত্তর ◊ (ক) রাবণের চিতা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের [illegible] দুপুরে ওই অঞ্চলে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। রামায়ণে আছে রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ মারা গেলেও তার স্ত্রী মন্দাদরী বিধবা হননি। কারণ রাবণের চিতার আগুন কখনও নেভেনি।

গারো পাহাড়ের নীচের জঙ্গলে আগুন লাগালে সেটা যেন জ্বলতেই থাকে। কখনও নিভতে চায় না। তাই এই আগুনকে রাবণের চিতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(খ) দুষ্টু শনি : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'গারো পাহাড়ের নীচে' রচনার অন্তর্গত। শনি হচ্ছে গ্রহরাজ। তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে অনেকে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, আবার তাঁর কু-দৃষ্টিতে অনেকে সর্বস্বান্ত হয়। পুরাণে আছে শনির দৃষ্টি গণেশের ওপর পড়লে তার মাথা উড়ে যায়। আবার শ্রীবৎস চিন্তামণি শনির কোপে পড়ে রাজ্যহারা হন এবং অশেষ দুঃখকষ্ট পান। গারো পাহাড়ের চাষিদের কাছে জমিদার ও মহাজন দুষ্টু শনিস্বরূপ। তাদের কোপে পড়ে এখানকার প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়।

(গ) হাতি বেগার : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'গারো পাহাড়ের নীচে' রচনার অন্তর্গত। জমিদারের মর্জির ওপর প্রজাদের সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করত। জমিদারের হাতি ধরার শখ হলে প্রজাদের বিনা পারিশ্রমিকে আসতে হত—সঙ্গে নিতে হত চিড়ে-গুড়। জমিদার মাচা বেঁধে তার ওপরে বসে থাকতেন। প্রজাদের সারা বন ঘিরে দাঁড়াতে হত। এতে করে অনেক প্রজা বাঘের খাবায় কিংবা সাপের কামড়ে মারা যেত। গারো পাহাড়ের নীচে এই প্রথা হাতি বেগার নামে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৮ **"কিন্তু মাঠ থেকে যা তোলে, তার সবটা ঘরে থাকে না"—(ক) কাদের সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? (খ) কেন বলা হয়েছে?** ২+৩

উত্তর ◊ সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গারো পাহাড়ের নীচে' রচনায় গারো পাহাড়ে বসবাসকারী গারো ও হাজং উপজাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(খ) হাজংরা পরিশ্রমী—তাদের চাষবাস করার দক্ষতা অসীম। তাদের খেতের ফসলের দিকে তাকালে এর সত্যতা বোঝা যায়। গারোরা এদের চাষের পোকা বলে। কারণ চাষবাসের এরা নাড়িনক্ষত্র ভালো করেই জানে। গারো পাহাড়ের যে-কোনো দিকে তাকালে মনে হবে পৃথিবীটা যেন সবুজের কার্পেটে ঢেকে গেছে।

ধানের প্রাচুর্যে চারদিক যেন আনন্দে মৌ মৌ করে। তবুও হাজংদের দিকে তাকালে মনে হবে এদের মনে শান্তি নেই, আনন্দ নেই। ধান কাটার সময় নারীপুরুষ কাস্তে নিয়ে মাঠে যায়। এমন-কি ছোটো ছোটো ছেলের দলও কুঁজো হয়ে পিঠে ধান নিয়ে খামারে ছোটে। কিন্তু উৎপাদিত ফসলের খুব সামান্য অংশই তাদের কপালে জোটে। জমিদার তার লেঠেল বাহিনীকে পাঠিয়ে দেয় তার প্রাপ্য বুঝে নিতে। জমিদারের হিসাব হাজংদের বোধগম্য হয় না। জমা-কর্জ-সুদ সবের হিসাব তাদের বুদ্ধিতে কুলোয় না। তাদের অধিকাংশই জমিদারের ভুয়ো-কূটবুদ্ধির কৌশলে বাঁধা। প্রজারা জমিদারের কূটকৌশলে হয় সর্বস্বান্ত। সাহসী কোনো প্রজা মুখ খুললে লাঠির আঘাতে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। লোহার নাল বাঁধানো নাগরা আর লাঠিকে ভয় করে না—এমন মানুষ সেখানে নেই। তাদের উৎপাদিত ফসলের খুব সামান্যই তাদের ঘরে ওঠে—অধিকাংশ যায় জমিদারের গোলায়।

প্রশ্ন ৯ **"উত্তরের আকাশটা বছরের শেষে একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে"—এই জ্বলে ওঠার দৃশ্য কোথায় কখন কেন দেখা যায়?** ১+৪

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১০ "ভয় পাবার কিছু নেই, আসলে ওটা মেঘ নয়"—(ক) কোথাকার দৃশ্য সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? (খ) জঙ্গলে আগুন লাগার পরে কী মজা হয়? ৩+২

উত্তর ◊ (ক) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'গারো পাহাড়ের নীচে' রচনায় মৈমনসিংহ অঞ্চলের উত্তরে গারো পাহাড় অঞ্চলের গারো-হাজংদের চাষাবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সমতল থেকে চৈত্র মাসের গারো পাহাড়ের দিকে তাকালে মনে হয় একরাশ ধোঁয়াটে মেঘে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের মাটি পাথুরে, যেখানে চাষাবাদ করা খুব কষ্টসাধ্য। পাথুরে মাটিতে রসকসের বালাই থাকে না। চৈত্র মাসে সব ঝোপঝাড় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তখন ওই অঞ্চলে বসবাসকারী গারো, হাজং উপজাতিরা ওইসব শুকনো গাছে আগুন লাগিয়ে দেয়। শুকনো ঝোপঝাড়ে আগুনের লকলকে শিখা চারদিক ছড়িয়ে পড়ে এবং অচিরেই সব পুড়ে গিয়ে ছাই-এ পরিণত হয়। সেই ছাই পাথুরে মাটির ওপর পড়ে একটা কোমল আস্তরণের সৃষ্টি করে। সেই মাটিতে বীজ বোনা হয়। জমিতে ধান, তামাক প্রভৃতি চাষ করা হয়। এইজাতীয় চাষকে ঝুম চাষ বলা হয়।

জঙ্গলে আগুন লাগলে স্থানীয় মানুষদের খুব মজা হয়। যদিও জঙ্গলে বসবাসকারী জীবজন্তুদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে, তবুও তারা প্রাণে বাঁচতে জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন পাহাড়ি মেয়ে পুরুষেরা মনের আনন্দে তাদের শিকার করে। আর সন্ধেবেলা নাচ ও গানের আসর বসায়।

Scanned with CamScanner